বিষয়সূচী

প্রার্থনা	(কবিতা)	অসীম সাহা	১
যে মানুষ প্রেমিক হতে শেখেনি	(কবিতা)	মহাদেব সাহা	২
মশারি-বৃত্তান্ত	(কবিতা)	সজল আহমেদ	৩
ফসিল	(কবিতা)	সজল আহমেদ	৪
সঠিক উত্তর	(কবিতা)	রেজাউদ্দিন স্টালিন	৪
একদা এক ইলিশ	(ছোটগল্প)	হরিশংকর জলদাস	৫
রাত্রির গভীরে	(কবিতা)	নিখিলেশ রায়	১১
ভ্রমণ সংগীত	(কবিতা)	নিখিলেশ রায়	১১
লিখে দিতে	(কবিতা)	মনিরুজ্জামান	১২
ভাঁড়ুদত্ত	(কবিতা)	অনীক মাহমুদ	১৪
তিন কন্যার কাহিনী	(উপন্যাস)	বলাই বাহুল্য	১৫
দাগ	(ছোটগল্প)	রাহেল রাজিব	৬৯
দু'জনে	(ছোটগল্প)	জাহিদ সোহাগ	৭৫
অনিঃশেষ	(কবিতা)	অরণি বসু	৭৭
বহুরূপে সম্মুখে তুমি	(কবিতা)	আবু দায়েন	৭৭
সরমার অভিশাপ	(ছোটগল্প)	সাধন চট্টোপাধ্যায়	৭৮
একটি খুনের প্রস্তুতি বৈঠকের পর	(ছোটগল্প)	মণি হায়দার	৮৩
আমাদের দিনরাত্রি	(ছোটগল্প)	জাকির তালুকদার	৮৯
দুঃস্বপ্নের নগরিকা	(কবিতা)	শামস্ আলদীন	১০০
আমি বৃষ্টি চেয়েছিলাম তোমার জন্য	(কবিতা)	নির্মলেন্দু গুণ	১০১
নিশিকাব্য-৯৫ মীর্জা গালিবের প্রতি	(কবিতা)	নির্মলেন্দু গুণ	১০১
কথা সব ফুরিয়ে গিয়েছে		রফিক আজাদ	১০২
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলাদেশ	(প্রবন্ধ)	ইয়ামীন আরা লেখা	১০৩
নীতিকথার পরের কথা	(প্রবন্ধ)	আনিসুজ্জামান	১১১
জীবনের প্রথম লণ্ডন ভ্রমণ	(ভ্রমণ কাহিনী)	বিজনকুমার মণ্ডল	১১৬
কান্নার প্রাচীর	(ছোটগল্প)	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	১২১
ছ'তলার কার্নিশে বৃষ্টি	(কবিতা)	সুলতানা শাহ্‌রিয়া পিউ	১২৭
হৃদয়-বেসাতি	(কবিতা)	সুলতানা শাহ্‌রিয়া পিউ	১২৭
জননী-যন্ত্রণা	(ছোটগল্প)	সত্য মণ্ডল	১২৮

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলাদেশ

ইয়াসমীন আরা লেখা

সাহিত্যিক, কবি এবং শিল্পী-মানুষের চেতনালোক সবার চেয়ে প্রাগ্রসর। তাঁরা সর্বকালেই সমস্ত চৈতন্য এবং অনুভূতির পুরোভাগে থাকেন। যেমন বর্ণ বৈচিত্র্যকে তারা অনুভব করেন, তেমনি মানুষের অস্থিরতা, যন্ত্রণা, আগ্রহ ও প্রশান্তিকে তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করেন। এভাবেই তাঁরা একটি জাতির চূড়ান্ত সচেতনতাকে বহন করে থাকেন।[১] অন্যান্য আর সবার মতো একজন কবির প্রাণকেও ধারণ করে সীমাবদ্ধ আয়তনের কোন না কোন দেশ বা প্রদেশ— যা তাঁর স্বদেশভূমি। 'প্রাণ ধারণের দেশ ও সময় যাপনের কাল' অন্য আর দশজন সামাজিক মানুষের চেয়ে একজন কবিকে প্রভাবিত করে অধিকভাবে। কবির অন্তরভূমিতে যে বিচিত্র অভিঘাত, তাঁর রূপরেখা যাই হোক না কেন, কবি মননের একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে থাকে কবির স্বদেশভূমি। সুতরাং সঙ্গত ভাবেই একজন কবি অন্তরের অনুভবলব্ধ বিপুলতা নিয়েই স্বাদেশিক। রবীন্দ্রনাথে আমরা এই অনুভব ও প্রকাশের চিত্র বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি।

উনিশ শতকের রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাঙালি কবি সাহিত্যিকবৃন্দও জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং জীবনের বিপুল প্রসারী অমঙ্গলকে তাঁদের স্নায়ু এবং মর্মে অনুভব করেন। এই মানসিকতা মূলত এই শতকের নবজাগরণের ফসল। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, বাঙালির নবজাগরণ অগ্রসর হয়েছে অত্যন্ত ক্ষীণ প্রবাহে।

বাংলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ও স্বদেশ প্রীতির ভাবচ্ছবি সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। পরবর্তীকালে রঙ্গলাল, হেম-নবীনের কাব্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায় ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ বা পৌরাণিক রূপকল্পে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যেই স্বাধীনচেতা ও স্বদেশপ্রীতির আবেগকল্প অস্থির, উদ্দাম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাম স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণ ও বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের উক্তি, রাবণের নিয়তিবোধ এবং বেদনার্ত হাহাকার প্রদীপ্ত ব্যঞ্জনায় অনুরণিত হয়েছে সে যুগের স্বাজাত্যবোধের অহমিকা।

পরবর্তীকালে বঙ্কিম উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী হিসেবেই নয়, বস্তুত তাঁর একই সৃজনশীল শক্তির নাভিস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে জাতীয়তার বেদমন্ত্র। এদিক দিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকও বিস্ময়কর সৃষ্টি। সমকালীন নীল চাষিদের দুর্দশা এবং কুঠি সাহেবদের পাশবিক অত্যাচারের জ্বলন্ত ছবি অঙ্কিত হয়েছে 'নীল দর্পণ' নাটকে।

সাহিত্যে ঐতিহ্য চেতনার অর্থ কেবল অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের ব্যবহার নয়। প্রকৃতপক্ষে এর তাৎপর্য হল সমাজ-সভ্যতা-মানবজাতির দ্বন্দ্বময় চলিষ্ণু জঙ্গম প্রাগ্রসরতার সত্যমূল্য নির্ণয়। অর্থাৎ ঐতিহ্যবোধ কোন বিক্ষিপ্ত চেতনার সংশ্লেষ নয়, বরং অনুপ্রবিষ্ট জৈবিক ঐক্য সম্পন্ন। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যেই সর্বপ্রথম ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ লক্ষিত হয়। তিনি ভারতীয় পুরাণের সিদ্ধবস্তুকে ভেঙে চুরে-দুমড়ে স্বচেতনতার অন্তর বাস্তবতায় ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

'মেঘনাদবদ কাব্যে' মধুসূদন রামায়ণের কাহিনির আখ্যানভাগকে স্বীয় উপলব্ধির রঙে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। রাম সেখানে দেব আশীর্বাদ পুষ্ট পররাজ্য লোভী মাত্র। পক্ষান্তরে মধুসূদন রাবণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন সমকালীন মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে; অন্যায়ের বিপক্ষে বৈপ্লবিক প্রতিরোধ। বস্তুতপক্ষে, রাবণের অমিত তেজ, বিপুল ঐশ্বর্য, স্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় আস্থা হিন্দু মধ্যবিত্তের জাগরণের মুহূর্তের আশাবাদদীপ্ত মানস প্রতিরূপ।[২]

একইভাবে প্রকৃতি, বিশেষত এদেশের প্রকৃতি বারবার কবিতায় বিষয়বস্তু হয়েছে তৎকালীন কবিদের কাদে। প্রকৃতি এক্ষেত্রে পটভূমি বা বিভাব মাত্র। বিহারীলালের হাতেই প্রথম চেতনার প্রকৃতি নির্মিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম স্বীয় মানসিকতায় গড়ে নেন প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা এবং বাঙালিকে বিশ্বের সামনে যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তেমন ভাবে বাংলাদেশকেও বাঙালির চোখের সামনে তুলে ধরেছেন নবতর ও মহত্তম মহিমার রঙে রাঙিয়ে। তাঁর কাব্যে

এবং জীবনে ঘটেছে বাংলাদেশের পুনরুজ্জীবন। তিনিই আমাদের স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি।[৩] বাংলাদেশের বৈষয়িক সম্পদই মাত্র নয়, এর প্রাণ প্রবাহের যে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ সেটাও মহিমান্বিত হয়ে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। 'শ্যাম বনানীর উদার প্রান্তর'[৪], পদ্মা-মেঘনা ও যমুনা নদীর পরিবেষ্টনে প্রকৃতি অপার সৌন্দর্য ও পর্যায়ক্রমিক ঋতুচক্রের হাজারো রঙের বাংলাদেশ যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। বাংলাদেশকে কবি তাঁর কবিতায় বিছিয়ে দিয়েছেন রজনীগন্ধার মতো থরে বিথরে।

'দেশ মাতৃকার যে গাছপালা, মাটি জল আকাশে
গ্রাম লোক-সংখ্যার সমষ্টি মাত্র নহে, এর অন্তরালে
তার যে চিরন্ময়ী রূপ আছে, আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি
হাজার বৎসর সুখদুঃখ বেদনা ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়া,
উত্থান পতন সমস্ত মিলিয়ে সহস্র পদ্মে সেই চিরন্ময়ী
জননীর পাদপীঠে রচনা করেছেন।'[৫]

জন্মভূমিকে মাতৃরূপে দেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয় ভাবের বিকাশ ঘটে।'[৬] কবি আত্মার এক বিশেষ স্থান ছেড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের জন্যে। পরবর্তীকালে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় এর বিকাশ ঘটে বহুল ভাবে। বাংলাদেশের সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটা শক্ত সেতুময় যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কবির নিজের ভাষায় :

'কি মাটি কি জল, কি গাছ-পালা, কি আকাশ
সমস্তই তখন কথা কহিত। মনকে কখনো
উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।'[৭]

খণ্ড খণ্ড অনুভূতিই সামগ্রিকতা লাভ করে এবং বাংলাদেশকে একটি বিশেষ কাঠামোতে দাঁড় করায়। 'খণ্ড ক্ষুদ্রকে সমষ্টিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করার জন্য দৃষ্টি ও মননের যে প্রসার প্রয়োজন, অন্যের পক্ষে যা পরিশীলনেও সম্ভব হয় না, রবীন্দ্রনাথে তা অনায়াসে লব্ধ।'[৮] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেন—

'The first stage of my realisation
was through my feeling of in time any
with the native'[৯]

'দেখার শক্তিতে তিনি প্রকৃতি থেকে রস আর মানবজীবন থেকে নিয়েছেন সত্য।'[১০] বাংলাদেশকেও তিনি অনুভব করেছিলেন এই দেখার শক্তি দিয়েই। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক উপকরণ থাকা দরকার এবং তার প্রকাশকে যেগুলো সম্ভাবিত করে তার উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথে প্রবল। আনন্দে বিষাদে, হতাশায়, নৈরাশ্যে, সুখে, দুঃখে; প্রতিরোধের স্পৃহায়, প্রতিরোধের প্রয়াসে, প্রতিকারের মানসে কবি বারাবার ফিরে এসেছেন বাংলাদেশ ও তার প্রকৃতির কাছে।

'ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি যে শ্যামল বঙ্গ দেশে
জয়দেব কবি আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিল দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যাম ছায়া; পূর্ণমেঘে মেদুর অম্বর।''[১১]

অতীতচারী কবি স্মৃতি রোমন্থন টেনে এনেছেন বাংলাদেশকে। এখানে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, আরেক কবিকে স্মরণ করেছেন সমকালের প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলাদেশের প্রকৃতি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এসেছে। কখনো এই প্রকৃতি তার মনের দুঃখ, বেদনা, কখনো আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক অনাবিষ্কৃত নৈরাশ্য ও বিষাদে কবি-দেখেছেন বাংলাদেশের বর্ষাকে—

'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধানকাটা হলো সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা
কাঁটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।"[১২]

নদী বিধৌত বাংলাদেশের চির শুভ্র সৌমরূপ ধরা পড়েছে তাঁর 'সুখ' কবিতায়—

'ভেসে যায় তরি
'প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোল। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি। যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে।' [১৩]

'দুই বিঘা জমি'তে কবির বঙ্গ বন্দনা আন্তরিকতার বিপুলতায় ভরপুর। হতভাগ্য জমি বিতাড়িত নায়কের চোখ দিয়ে কবি নিজেই দেখেছেন শাশ্বত বাংলাদেশকে। এ যেন জননীর প্রতি সন্তানের স্বীকারোক্তি-

'নমো নমো নমো, সুন্দরী মম-জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি
অবারিত মাঠ, গগন ললাট, চুমে তব পদধুলি
ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল-নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।'[১৪]

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' পর্যায়ে বাংলাদেশের চিত্র বহুতর দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্ত করেছেন। এ পর্যায়ে মাতৃভূমিকে স্বর্গের চেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে করেছেন—

মর্ত ভূমি স্বর্গ নহে
সে যে মাতৃভূমি-তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রু জলধারা।[১৫]

অথবা

যদি জন্মে প্রেয়সী আমার নদী তীরে
কোনো এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থ ছায়ায়[১৬]

'বঙ্গমাতা' কবিতায় কবি বাংলাদেশকে অনার্য সুলভ গৃহমুখিতা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। মায়ের কাছে সন্তান যেভাবে আবদার করে, অনুযোগ করে কবিও বঙ্গভূমির কাছে সেই আবদার করেছেন বাংলাদেশকে মাতৃজ্ঞান করে—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে

চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।[১৭]

বাংলাদেশ কবির একাকিত্বের সঙ্গী হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। ঋতু পরিক্রমায় প্রকৃতি যে ভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তার সাক্ষাৎ মেলে এখানে—

আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে
হেমন্ত ধানের ক্ষেতের বাতাস উঠেছে মেতে
কেমনে চলিব পথ চিনে।
আজি এ দুরন্ত দুর্দিনে[১৮]

আশ্বিন মাসের বঙ্গ প্রকৃতি কবিকে প্রভাবিত করেছে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ভাবে। শুধু আশ্বিনের ঝড়ই নয়, কবি কালবৈশাখির প্রচণ্ড লীলাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলাদেশের মাটিতেই। বৈশাখের প্রচণ্ড শক্তি সত্তাকে ডেকেছেন ভৈরব বলে—

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটা জাল,
তপ: ক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
করে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।[১৯]

এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছে এদেশের প্রকৃতি। নব সাজে নতুন ঢং- এ প্রকৃতি তার কাছে ধরা দিয়েছে। মূলত বাংলাদেশের প্রকৃতিকে পছন্দ করেন বলেই কবি এদেশের যান্ত্রিক জটিলতায় ব্যথিত। প্রাণের প্রবাহ খুঁজে পান না কবি এর মধ্যে। তাই বলেছেন—

আমি চাই না হতে নব বঙ্গের নব যুগের চালক।[২০]

তেমন বাংলাদেশকেই কবি চাইছেন যেখানে—

ওরে শাওন মেঘের ছায়াপড়ে কালো তমাল মূলে
ওরে এপার ওপার আধার হলো কালী নদীরই কুলে
কুঞ্জ বনে নাচে ময়ূর কলাপখানি তুলে।[২১]

বস্তুত 'ক্ষণিকা' পর্যায়ে কবি মননে বাংলাদেশ বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এ পর্যায়ে অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন কবি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। যেমন 'আষাঢ়' কবিতায় আষাঢ় মাসের প্রকৃতি দেখে কবি রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন। বৃষ্টি পতনের শব্দ কবিকে আলোড়িত করেছে। তাই তিনি ডেকে বলেছেন—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউষের খেত জলে ভর ভর
কালিমাখা মেঘে ওপার আঁধার।
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।[২২]

বর্ষার ভরা প্রকৃতিতে কবির প্রাণও নেচে ওঠেছে। তাই কবি গেয়ে ওঠেন— "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে।" কবির হৃদয় পেয়েছে ময়ূরের ছন্দ—

'ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।'[২৩]

বাংলাদেশের সঙ্গে কবির ছিল নাড়ির সম্পর্ক। এদেশের জন্যে যাঁরা পূর্বে অনুভব করেছেন কবি কৃতজ্ঞতা বশত তাঁদের অভিনন্দিত করেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ করে বলেছেন -

কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছে আনন্দের হিল্লোল তোমার বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রী দল রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে।
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে[২৪]

'পৃথিবী' কবিতায় কবি সমস্ত বিশ্বকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশকেই তিনি চিত্রিত করেছেন।—

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎ চঞ্চু.....
.....
কালো শ্যামল পাখির মত তোমার ঝড়[২৫]

অথবা

আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার অতপ্ত দক্ষিণ
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ মিলনের স্বগত প্রলাপ মুকুলের গন্ধ
দাদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে.....।[২৬]

শেষ বিদায়ের পরও কবি মানসচক্ষে যে পৃথিবী দেখতে চেয়েছেন, যে জীবনকে দেখতে চেয়েছেন সেটাও বাংলাদেশের। শেষ বিদায়ের দিন যাকে বন্দনা করতে চাচ্ছেন সেও বাংলাদেশে। কারণ বাংলাদেশ কবিকে দিয়েছে আতিথ্যের স্বাদ—

কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে, কভু আম্র মুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বান বাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর।[২৭]

মূলত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বাংলাদেশকে উপস্থাপিত করেছেন বিচিত্র এবং বিপুলভাবে। তাঁর প্রাণের সুর বাঁধা ছিল বাংলাদেশের তালে। তিনি বাংলাদেশ, তার প্রকৃতি, সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর কবিতাই তার পরিচয় বহন করে। এ প্রসঙ্গে ড. মোহম্মদ মনিরুজ্জামানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন 'তাঁর শিকড় আছে বাংলাদেশের মাটিতে। যখন তিনি সমগ্র ভারতের কথা বলেন তখন তাঁর পা বাংলাদেশের মাটিতেই।'[২৮] এ কথা থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথের কত কাছাকাছি ছিল।

কবিতায় বাংলাদেশ যতটুকু প্রস্ফুটিত, রবীন্দ্রনাথের গানে তা আরো বিস্ময়কর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এত দরদ ও এত নিগুঢ় অনুভব নিয়ে অন্য ভাষায় স্বদেশ বন্দনা আর কোথাও রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ তথা

বাংলাদেশকে উদ্দেশ করে এই নিবেদনমূলক গানগুলো রচনা করেছিলেন।

১৮৯৭ সাল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কবির স্বদেশ প্রেমের বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' প্রথম গাওয়া হয়। একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিবাহিনী তখন সমগ্র বাঙালি যাদুস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন তিনি আমাদের মুক্তি যুদ্ধের এক প্রধান প্রেরণা, পুনর্মূল্যায়িত তাঁর গান আমাদের জাতীয় সংগীত।[২৯] এই গানের প্রতিটি ধ্বনি জীবন্ত বাংলাদেশকেই তুলে ধরেছে।

ধেনু চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে
মরি হায় হায়রে
ও, মা আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা তোমার রাখাল তোমার চাষা।[৩০]

স্বদেশী যুগে কয়েক সহস্র গান জাতীয় ভাবপূর্ণ সংগীত বাংলাভাষায় রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথের গানই সর্বাধিক। দেশ মাতৃকাকে তিনি যে গভীর ভাবে ভালোবেসেছিলেন সেই প্রেম সেই স্বর্গই শত সহস্র ধারায় তাঁর গানের মাঝে উৎসারিত হয়েছিল।[৩১] বাংলাদেশের আলো বাতাস কবিকে বর্ধিত করেছে দৈহিক ও মানসিকভাবে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কবিও দেশের মাটিকে প্রণাম করেছেন।

সেবার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা
ও আমার দেশের মাটি তোর পরে ঠেকাই মাথা।[৩২]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন কবি। বাংলাদেশ ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে, এটা তিনি কামনা করেন নি। দেশমাতৃকার অখণ্ডতাই তাঁর কাম্য ছিল। ১৯০৫ সালের ষোলই অক্টোবর 'রাখী বন্ধন' উৎসবের জন্যে রচনা করেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।[৩৩]

শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলার মানুষ অর্থাৎ বাঙালির জন্যে তাঁর কামনা ছিল—

বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।[৩৪]

স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে কবি বাঙালির একটি প্রচণ্ড জাগরণ লক্ষ করেছিলেন আর তা দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। একে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি এভাবে—

এবার তোর মরা গাঙ্গে বাণ জয়যাছে এসে বলে ভাসাতরী
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণ পণে ভাই ডাকদে আজি।[৩৫]

বঙ্গভঙ্গ রোধে কবি আশাতীত আনন্দিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশকে তিনি একক মা হিসেবে গণ্য করতেন এবং সমস্ত বাঙালিকে মনে করতেন ভাই হিসেবে। পুনর্মিলনে তিনি লিখলেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।[৩৬]

কবি উত্থান-পতনে সর্বাবস্থায় বাংলাদেশকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করতেন। পরাধীন দেশের কুফলকে প্রতিরোধের স্পৃহা পেতেন বাংলাদেশ থেকেই। চির শান্ত বাংলাদেশকে রণ সাজে সজ্জিত হতে দেখে কবি আশাবাদী হয়ে ওঠেছেন—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।[৩৭]

তারপর আরো বলেছেন—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁহাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুন বরণ।[৩৮]

অর্থাৎ একই সাথে ভয়ঙ্কর আর শান্ত এই দুটি রূপকেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলাদেশে।

মাধুর্যের পুষ্পময় ছোঁয়ায় বাংলাাদেশ তাঁর কবিতায় এক বিমূর্ত রূপ ধারণ করেছে—

অয়ি ভুবন মনমোহিনী
অয়ি নির্মল ধরণী শুভ্র করোজ্জ্বল।[৩৯]

এদেশে কবি জন্মগ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের জন্মকে সার্থক বলে মনে করেছেন। তাঁর এ ধরনের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে নিম্ন কবিতাটিতে—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।[৪০]

আর তাই কবি সুখ-দুঃখে, আশা-নিরাশায়, কামনা-প্রত্যাশায় সর্বাবস্থায়ই ছিলেন অবিচল। কবি তাঁর জন্ম জন্মান্তরকাল, অনন্তকাল বাংলাদেশেই বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বক্তব্য—

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা।

কারণ—

তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা ভুলতে সে যে পারব না মা।[৪১]

এভাবেই তিনি বাংলাদেশ অর্থাৎ তাঁর স্বদেশভূমির সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। নিজের সত্তাকে লীন করে দিয়েছেন বাংলাদেশের মাঝে।

বস্তুত এই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি। একজন দেশপ্রেমিকের মতো অন্তরের সমস্ত উচ্ছ্বাস দিয়ে ভালোবেসে ছিলেন বাংলাদেশকে এবং ভালোবাসা প্রকাশও করেছিলেন নির্দ্বিধায় এবং গৌরবের সঙ্গে।

তথ্যসূত্র :

১. সৈয়দ আকরম হোসেন-'চতুরঙ্গে রবীন্দ্রমানস', তার পরিপ্রেক্ষিত, উত্তরাধিকার, ৭ম বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, জানু-মার্চ ১৯৭৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৯।
২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'ভূমিকা' আধুনিক কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০, পৃ. ২৪।
৩. বুদ্ধদেব বসু, 'সব পেয়েছির দেশে,' নাভানা সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬০, পৃ. ৯৪।
৪. হুমায়ুন কবির, বাংলার কাব্য, ২য় সংস্করণ, ১৩৮০, কলিকাতা।
৫. শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার, জাতীয় আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫২, কলিকাতা, পৃ. ৭৪।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- জীবনস্মৃতি।
৮. আহমদ শরীফ, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্র মনীষা, বিচিত্র চিন্তা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৩২৫।
৯. Tegoe; Religion of Man.
১০. মৈত্রেয়ী দেবী, কবি সার্বভৌম; কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৮, পৃ. ৫৩।
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানসী, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠকুর, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী।
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী।
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৭৯, ১লা পৌষ।
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী।
১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈতালী, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৫৬।
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , কল্পনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, বিশ্বভারতী, পৃ.১৫৬।
১৯. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬২।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুর্ণমুদ্রণ ১৩৬২।
২১. প্রাগুক্ত।
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৭, রবীন্দ্রভারতী, পৃ. ২২৮-২২৯।
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৩১।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী,সপ্তম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী, পৃ. ১০০।
২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. রবীন্দ্রনাথ, প্রান্তিক, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, রবীন্দ্রভারতী।
২৮. ড. মোহম্মদ মনিরুজ্জামান, ৮ই মে ১৯৮০ এর ক্লাস বক্তৃতা।
২৯. ড. মোহম্মদ মনিরুজ্জামান, আমি তোমাদেরই লোক, সচিব বাংলাদেশ, মে সংখ্যা ১৯৮০, পৃ. ৩২।
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশ গীতবিতান, প্রথম প্রকাশ (একত্রে তিন খণ্ড) আশ্বিন ১৩৩৮, বিশ্বভারতী।
৩১. শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার, জাতীয় আন্দোলনঃ রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ ১৩৫২, প্রকাশ স্থান কলকাতা।
৩২. স্বদেশ - প্রাগুক্ত।
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. প্রাগুক্ত।
৩৫. প্রাগুক্ত।
৩৬. প্রাগুক্ত।
৩৭. প্রাগুক্ত।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. প্রাগুক্ত।
৪০. প্রাগুক্ত।
৪১. প্রাগুক্ত।